মহারানির উর্দি ও তিসিখালির কুতুবুদ্দি

জাকির তালুকদার

(উৎসর্গ কথাশিল্পী কায়েস আহমেদ)

।। এক ।।

খাকি জামা সপ্তাহে একদিনই গায়ে চড়ায় কুতুবুদ্দি। হাটবারে। সেটাও সারা বছর নয়। বছরে পাঁচ মাস। আষাঢ় থেকে কার্তিক। কারণ এই পাঁচমাসই বিলে পানি থাকে। কুতুবুদ্দির কিছু আয় উপার্জন হয়। বাকি সাত মাস বিল শুকনো ঠনঠনে। কুতুবুদ্দিরও তখন পেট টনটন, মাথা খাঁ খাঁ। বিল অঞ্চলের মানুষের তখন অনেক কাজ। দুইবার ইরি ধানের চাষ সেরে ফেলতে হয়। কুতুবুদ্দির ওসববালাই নেই। কারণ তার জমি নাই। তাছাড়া অন্যের খেতে মজুরি করার বয়স তার নাই। ইচ্ছাও কোনোকালে ছিল না। তাহলে সেই শুকনো সাতমাস কুতুবুদ্দি করে কী? পাখি ধরে বিক্রি করে। বনমালির তাড়িভাটিতে কাজ করে। দিনগুলো খুব কষ্টে কষ্টে কাটে।

কিন্তু এখন আশ্বিন মাস। বিলে ফশা তোলা পানির ঢেউ। অতএব কুতুবুদ্দির চিন্তা নেই। তার ওপর আজ হাটবার। কুতুবুদ্দির গায়ে আজ খাকি জামা। ডিনে কাজ, রাটে ফুর্তি। শিখিয়েছিল লেপ্টান টমসন সাহেব। কুতুবুদ্দি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সেকথা। পুরো ইউনিয়নে কুতুবুদ্দি সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। একসময়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট টমসনের বাবুর্চি কম আর্দালি ছিল সে।সেই সময় যেখানে ইংরেজ আর সেখানে টমসন সাহেব। ফলে সেখানে কুতুবুদ্দিও। এইভাবে অনেক জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে তার। সেইসব জায়গা এখন অন্য অন্য দেশ। অন্য দেশ মানেই হল বিলাত। অর্থাৎ এই ইউনিয়নের প্রথম বিলাতফেরতও হচ্ছে কুতুবুদ্দি। পল্টন থেকে ফিরে আসার পরে পুরো বিল অঞ্চলে তার সম্মান ছিল চৌধুরীদের পরেই। এখন আর সেই সম্মান নেই। সম্মান দেখাবেই বা কে? যারা তার গোরাবাহিনীতে ঢোকার কথা জানত, তারা কেউই আর বেঁচে নেই। তার সমসাময়িকরা তো নেই, ঢের কমবয়সি অনেকেই টেঁসে গেছে। কিন্তু কুতুবুদ্দির লেফট - রাইট ড্রিল করা লোহাপেটা শরীর। আর ছিল পল্টনের খাঁটি দুধ-ঘি। এখনও আজরাইল তার সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে আসেনি। এই বয়সেও সে কারও ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে বসেনি। অবশ্য চাপার মতো কোনো কাঁধও তারনেই। তিন কুল তার রক্ত সম্পর্কের কেউ আছে বলে সে জানে না। নিজের ভাত সে নিজেই জোগাড় করে। বছরের এই সময় তার কোনো চিন্তা নাই।তার নিজের একটা নৌকা আছে। কেরায়া খাটলে পয়সার অভাব নাই।

ইদানীং অবশ্য স্যালো ফিট করা নৌকার চল হয়েছে। বড়ো বড়ো সাইজের নৌকা। পেছন দিকে স্যালো বসানো। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চাপ দিলেই ফট - ফট - ফট। সাঁ সাঁ করে পানি কেটে ছোটে নৌকা। মাঝির কাজ বলতে শুধু হাল ধরে দিক ঠিক রাখা। এখনএই ফটফটানিতে জয়-জয়কার। কারণ দাঁড়টানা কিংবা গুনটানা নৌকার চেয়ে অনেক জোরে ছোটে স্যালোর নৌকা। দুই-পাঁচ মাইল যেতে আগে যেখানে পাঁচ-ছয় ঘন্টা লেগে যেত, স্যালোর নৌকাতে লাগে আধঘন্টা - চল্লিশ মিনিট। লোকে ওগুলোতেই বেশি ওঠে। কিন্তু নিজের নৌকাতে স্যালো ফিট করেনি কুতুবুদ্দি। কেউ একথা বললে সে-ই উলটো নাক সিটকায়। আরে ইঞ্জিনে নাও ঠ্যালে, তুমি খালি হাল ধরে বসে থাকো--- এড্যা তো মাগি মাইনষের কাম। মরদ হও তো মারো বৈঠা। আমি মরদ। বৈঠা মারি।

কুতুবুদ্দি যাই বলুক, লোকে এখন সহজে স্যালো ছেড়ে দাঁড়টানা নৌকায় উঠতে চায় না। গাঁয়ের লোকও সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছে।
সারি সারি কেরায়া নৌকা ঘাটে বাঁধা। কুতুবুদ্দিরটাও। লোকে টপাটপ উঠে যাচ্ছে স্যালো নৌকায়। কেউ তেমন একটা গা করছে না দাঁড়টানা নৌকার দিকে। দশ - পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা করে নৌকা ভরে যাচ্ছে যাত্রীতে। তারা স্টার্ট দিয়ে ভটভটিয়ে চলে যাচ্ছে ঘাট ছেড়ে। কুতুবুদ্দি ডোন্ট কেয়ার ভাব করে নিজের নৌকায় বসে আছে। বিড়ি ফুঁকছে একটার পর একটা। কিন্তু তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন ফরমান সরকারকে স্যালোর নৌকায় উঠতে দেখল। ফরমান সরকার তার পারমানেন্ট যাত্রীদের মধ্যে একজন। আজ সে-ও ! তার দিকে তাকিয়ে একটু সান্ত্বনার হাসি হাসল সরকার -- আমার আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরা দরকার বাবাজি।
কুতুবুদ্দি মাথা ঝাঁকাল নিরর্থকভাবে। তারপরে পকেটের সর্বশেষ বিড়িটা ধরাল। ঠিক করল এটা শেষ করে সে যাত্রী ধরারজন্য একটু তৎপর হবে। হাঁকডাক করবে। বিড়ি হাতে সে নৌকা ছেড়ে পাড়ে উঠে এল। তখনই তার চোখে পড়ল চায়ের দোকানের বেঞ্চি ছেড়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে দুইজন পুষ, একজন মহিলা। এদের সে চেনে। বিল অঞ্চলে এনজিও-র সাহেব আর ম্যাডাম। এরা বেশ পয়সা খরচ করে। কেরায়া নৌকা না নিয়ে পুরো নৌকা রিজার্ভ করে সারাদিনের জন্য। বিভিন্ন গাঁয়ে ঘোরে। তাদের দিকে হাসি মুখে এগিয়ে গেল কুতুবুদ্দি -- আছেন ছার, আমার নায়ে আসেন।
তারাও কুতুবুদ্দিকে চেনে। একজন হেসে বলে --- তোমার দাঁড়টানা নৌকায় তো আমাদের চলবে না বাবা।
কুতুবুদ্দির মুখের হাসি দপ করে নিভে যায়। তার এই নিভে যাওয়া দৃষ্টি এড়ায় না ম্যাডামের। তার মুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে ওঠে। ধীর গলায় বলে -- আজ তো আমাদের সার্ভে মাত্র দুটো গ্রাম। খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই। তাছাড়া ইঞ্জিনের নৌকার শব্দে আমার মাথা ধরে যায়। আজ না হয় আমরা চাচামিয়ার নৌকাতেই যাই।
মেয়েদের কথা খুব ঠেকায় না পড়লে পুষরা ফেরায় না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ওদের নিয়ে হাসিমুখে নৌকা ছাড়ল কুতুবুদ্দি।

আরোহীরা বেশ আয়েশ করে ছইয়ের নীচে বসেছে। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কিছুক্ষণ ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল কুতুবুদ্দি। শুনল কিন্তু বুঝল না প্রায় কিছুই। ওদের সম্পর্কে তার কৌতূহল অনেকদিনের। আজ মওকা পেয়ে কিছুটা মেটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ভেবে সে গলা খাঁকারি দিল। জিজ্ঞেস করল -- ছার যদি বেয়াদপি না ন্যান, আপনেরা তো এনজু !
---এনজু !
ওরা হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকায়। অল্প পরে নিজেরাই অবশ্য বুঝতে পারে কুতুবুদ্দির আঞ্চলিক ভাষায় বলা কথাটা --- হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এনজিও কর্মী।
--- তা ছার আপনেরা টাউনের মানুষ গাঁয়ে আইছেন। কিন্তু করেনডা কী? আপনেরা কি গরিব মাইনষেক বড়োলোক বানাবার আইছেন?
ওরা হো হো করে হেসে ফেলে তার কথা শুনে --- তাহলে তো আলাদ্দিনের চেরাগ লাগবে চাচামিয়া। অত ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা শুধু গ্রামের মানুষদের নিজেদের অধিকারের কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি।
--- ঠিক বুঝলাম না।
--- বুঝলেন না? যেমন ধরেন দেশে আইন বলে একটা জিনিস আছে তা জানেন?
--- তা জানি। আইন তো সবতাতেই আছে।
--- হ্যাঁ। সবকিছুরই আইন আছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ অনেক সময় আইনের কথা না জানা থাকায় ন্যায্য বিচার চাইতেও জানে না।
কুতুবুদ্দি গর চোখে তাকিয়ে থাকে। ম্যাডাম তখন তাকে বোঝাতে শু করে --- যেমন ধরেন কোনো স্বামী তার বউকে তিনবার তালাক বললেই তার তালাক হয়ে যায়।
--- হ্যাঁ, তা যায় ।

--- কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা অবৈধ। শুধু মুখের কথায় তালাক হবে না। তারপরে ধরেন, তালাকের পরে বউটার কী হয়?

--- কী আর হয়! হয় অন্য কারও সাতে নিকা বসে, না হয় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে।

--- হ্যাঁ তাই। কিন্তু আইন হচ্ছে, তালাকের পরেও স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোষের টাকা দিতে বাধ্য। তাদের যদি সন্তান থাকে, আর সেই সন্তান যদি মায়ের কাছে থাকে। তাহলে সেই সন্তানের খরচও পিতাকে বহন করতে হবে।

--- অ। বুঝলাম। তা আপনেরা টাউন থাক্যা গাঁয়ে এইসব শুনাতে আসেন ক্যান?

ওরা তিনজন এই প্রশ্নে আবার একচোট হাসে --- এটাই আমাদের চাকরি। এই কাজ করার জন্যই আমরা বেতন পাই।

---কে দ্যায় আপনাদের বেদন ? গরমেন?

--- না বাবা। গভর্নমেন্ট নয়। আমাদের বেতন দেয় বিদেশি লোকজন। বিদেশ মানে বোঝেন। মানে বিলাত।

এবার মনে মনে ঠোঁট বাঁকায় কুতুবুদ্দি। এরা এসেছে তাকে বিলাত বোঝাতে। বলতে গেলে তার পুরো যৌবন কেটেছে বিলাতের মানুষের সঙ্গে। ওই টমসন সাহেবের দেশের লোকেরাই তাহলে এনজিও-কে টাকা দেয়। তা ওরা দিতেই পারে। কুতুবুদ্দি দেখেছে গোরা সাহেবরা যেমন কথায় কথায় পাছায় লাথি মারতে পারত, চাবকাতে পারত, তেমনি ঝনাৎ করে পকেট থেকে রানিমার্কা চাঁদির টাকা ছুঁড়ে দিত তাদের দিকে।

হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে -- তা চাচা আপনাকে প্রায়ই দেখি খাকি জামা পরতে। আপনি কি চৌকিদার ছিলেন?

একেবারে প্রেস্টিজে ঘা লাগে কুতুবুদ্দির -- না। আমি আছিলাম মহারানির রয়েল আর্মিত।

ওরা তেমন একটা চমকিত হয় না। শুধু মেয়েটা বলে -- তাই নাকি?

তারপরেই ওরা ফের নিজেদের মধ্যে আলাপ শু করে।

তার পল্টন জীবনের স্মৃতিচাররণার সুযোগ না দেওয়াতে কুতুবুদ্দি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়। বাধ্য হয়েই তাকে ওদের কথা শুনে যেতে হয়। একজন বেশ উষ্মার সঙ্গে বলে -- ধুর! চাকরি করি বটে, কিন্তু এনজিও-র এসব ওপরপালিশ দেওয়া কাজ আমার পছন্দ হয় না।

--- ওপরপালিশ দেওয়া নয়তো কি বিপ্লব করবে এনজিও! সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কি বিপ্লব করার জন্য আমাদের টাকা দিচ্ছে?

--- এইসব সাহায্যের নামে ওরা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে। এক টাকা ডোনেশন দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এক কোটি টাকা। আর আমরা হচ্ছি শালা ওদের দালাল, পাতিদালাল, তস্য দালাল।

---জানেন, সার্ভে করতে গিয়ে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এই বিশাল চলনবিলের বেশি ভাগ জমির মালিক মাত্র কয়েকজন। কারও কারও জমির পরিমাণ হাজার বিঘা। অথচ এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যারা বছরে একবারই শুধু মাংস খাবার সুযোগ পায়। তা হচ্ছে কোরবানির ইদে। কী বৈষম্য!

একজন পকেট থেকে নোটবুক বের করে --- আমি বৈষম্যের কিছু তথ্য পেয়েছি। আন্তর্জাতিক তথ্য। পড়ে শোনাচ্ছি শুনুন। ১৯৬৫ সালে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের শতকরা ২.৩ ভাগ ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম বিশ ভাগ লোকের হাতে, তার ওপরে বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল সম্পদের ২.৯ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগ লোকের হাতে ৪.২ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১.২ ভাগ। আর সবেচেয়ে ধনী বিশ ভাগ লোকের দখলে ছিল পৃথিবীর মোট সম্পদের ৬.৯ ভাগ। পাঁচ বছর পরের অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের রিপোর্ট হচ্ছে --- দরিদ্রতম বিশ ভাগ মানুষের সম্পদ কমে দাঁড়াল ২.২ ভাগে, তার ওপরের বিশ ভাগের ২.৮ ভাগ, তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ৩.৯ ভাগ, তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১.৩ ভাগ এবং সবচেয়ে ধনীদের হাতে ৭০.৪ ভাগ।

---আর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, দরিদ্রতমদের ভাগ সম্পদ নেমে দাঁড়াল ২.৩ থেকে ১.৪, তার ওপরে ২.৯ থেকে ১.৮, তার ওপরে ৪.২ থেকে ২.১, তার ওপরে ২১.২ থেকে ১১.৩ এবং সহচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পত্তি ৬৯.৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৩.৪ ভাগ।

অনেক্ষণ বৈঠা এবং জলের শব্দ ছাড়া নৌকাতে কোনো শব্দ রইল না। তিনজনই নাথা নীচু করে ভাবছে সত্য কথাগুলি। পাশ দিয়ে একটা স্যালো নৌকা ভটভটিয়ে চলে গেল। সেটি সাইজে বেশ বড়োসড়ো। ফলে একটা ঢেউ উঠল। কুতুবুদ্দির

নৌকা স্বাভাবিকের চেয়ে দুলল বেশি। স্যালোর শব্দ দূরে চলে যাবার পরে সর্বশেষ বক্তব্যটি পাঠ হল নোটবুক থেকে --- পৃথিবীর সহচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোক মানে আসলে কিন্তু কুড়ি ভাগ নয়। সম্পদের সিংহভাগ অধিকারী মাত্র তিনশো ছাপান্নটি পরিবার। বাকিরা এদের পোষ্য, স্তাবক, অনুগৃহীতের দল।

ম্যাডাম ফিস ফিস করে বলল --- তার মানে গরিবরা আরও গরিব, আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, আর ধনীরা আরও ধনী!

কুতুবুদ্দির অভ্যেস হচ্ছে, সহজে সে কিছুতেই অবাক হয় না। সে ফস করে বলে ফেলল --- এড্যা বুঝতে তো বই - খাতা লাগে না। এই বিলের একবিঘা - দুইবিঘা জমিআলারা জমি হারায় বছর বছর আর ছরোয়ার চিয়ারম্যান টাউনে নতুন নতুন একখান কর্য্যাবাড়ি বানায়।

।। দুই ।।

ডিনে কাজ, রাটে ফুর্টি।

টমসন সাহেবের শিক্ষা অনুযায়ী কুতুবুদ্দি সন্ধে নামতেই ফুর্তি করে নিয়েছে। মাগরিবের আজান শোনামাত্র সে চলে গিয়েছিল বনমালী কুজুরের তাড়িভাটিতে। বয়স হয়েছে। বেশি তাড়ি পেটে সয় না। তবু যতখানি পারা যায় গিলেছে। তারপর গিয়ে বসেছে মহিম ঘোষের জিলিপির দোকানে। এই বিলের মধ্যে বিদ্যুৎহীন জনপদগুলোতে রাত আটটা মানে এমনিতেই অনেক রাত। তার ওপরে কয়েক বছর হল সর্বহারাদের উপদ্রবে লোকজন পারলে সাঁঝ না হতেই দুয়ার দেয়। তবু বনেদি হাট বলে কথা। হাটের দিনে একটু - আধটু রাত হয়েই যায়। টিনের প্লেটে তার সামনে জিলিপি রাখতে ত্যারছা চোখে তাকায় মহিম ঘোষ--- পয়সা আছে তো? বাকি কিন্তু দিতে পারব না আজ।

পয়সা নাই মানে! সে কি ভিখিরি! কুতুবুদ্দি উর্দির পকেট হাতড়ায়। এখনই সে অগ্রিম টাকা ছুঁড়ে ফেলে ঘোষের ব্যাটার মুখে। এ পকেট, আরে পকেট। ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকানোর সময় বামদিকে কাত হয়ে থাকে সে। কাত হতে হতে কেতরে পড়ে বেঞ্চের ওপর। দোকানের লোকজন হেসে ওঠে হো হো করে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গলায় হেঁকে ওঠে কুতুবুদ্দি - হল্ট! হুকুমদার!

তার চিৎকার শুনে আরও জোরে হেসে ওঠে লোকজন। আবারও হেঁকে উঠতে চায় কুতুবুদ্দি। কিন্তু হাত নিয়ে বেকায়দায় পড়ে। পকেট থেকে বের হচ্ছে না দুটো আঙুল। জোরে টান দিতে পকেট বেরিয়ে আসছে। আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে কয়েকটা খুচরো পয়সা। মহিম ঘোষ খনখনে গলায় বলে -- ওই পয়সায় তো জিলাপি হয় না বাপজান। ট্যাকা যা কামাই করিছিলে সব বোধহয় দিয়া আইছ বনমালিরে। মাল খ্যায়া পয়সা হজম।

আঁতে খুব ঘা খায় কুতুবুদ্দি -- তোর জিলাপিত আমি লাথ্‌থি মারি। মাল খাইছি আমার ট্যাকা দিয়্যা। তোর বাপের কী?

একজন সহানুভূতির সঙ্গে বলে -- বুড়া বয়স, এট্টু আল্লা - বিল্লা করবি তা না, খালি তাড়ি খ্যায়া মাতাল হয়্যা ঘুরে!

ধমকে ওঠে কুতুবুদ্দি -- চোপরাও! হাম মেলেটারি লোক। মেলেটারি মাল খাবি না তো কি সাগু - বার্লি খাবি?

--- বাপের আমার মেলেটারি রে।

কুতুবুদ্দি সুস্থির হয়ে বসতে চায়। কিন্তু বেঞ্চি যেন তার মাথাকে চুম্বকের মতো টানছে। অনেক কষ্টে সে মাথাটাকে সোজা করে। তার ফুর্তি আজ একটু বেশি হয়ে গেছে। আধখোলা চোখে জিলিপির থালা খোঁজে। কই থালা কই। অ্যাই ঘোষের বাচচা, জিলাপি কাঁহা?

--- ট্যাকা নাই, জিলাপিও নাই।

--- তাহালে একখান বিড়ি দে।

--- কে তোমার জন্যে বিড়ির ফ্যাক্টিরি খুলে রাখিছে! বিড়ি কিনতেও পয়সা লাগে। এবার পশুর মতো ক্ষেপে ওঠে কুতুবুদ্দি --- শালা মাক্কিচোষ! মাছির গোয়া চিপ্যা খাস। এই জন্যই তো সর্বহারারা তোদের পোন্দে বাঁশ ঢুকায়।

শব্দটা উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের লোকগুলো কাঁটা হয়ে যায়। ভয় আর অস্বস্তি নিয়ে পরস্পর চোখাচোখি করে। শেষ লোকমান মিয়া পকেট থেকে বিড়ি বের করে -- লে বাবা একখান বিড়িই তো খাবু। তার জন্যে এত চিল্লাচিল্লি কিসের। বিড়ি পেয়ে একটু শান্ত হয় কুতুবুদ্দি। তার বয়স্ক ফুসফুস অনেক কমজোরি হয়ে পড়েছে। তবু বুকভর্তি ধোঁয়া টানার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে কাশির দমক। ঘরঘর করে শ্লেষ্মার শব্দ ওঠে। কিছু কিছু তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। কারও গ

ায়েও মেখেযায়। ওরা গাল বকে ওঠে। কিন্তু কুতুবুদ্দির তা শোনার সময় নেই। সে কাশতেই থাকে। তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে, চোখ উলটেআসে। মুখ হাঁ করে সে বাতাসের জন্যে খাবি খায়। বাতাস তাকে ফাঁকি দিয়ে তারশ্বাসযন্ত্রের ব াইরে দিয়ে বয়ে চলে। ভেতরে ঢোকেনা।

--- শালার বুড়া কি মরতে বসিছে?

লোকমান মিয়া উঠে এসে কুতুবুদ্দির চাঁদিতে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে থাকে। একটা হাত রাখে তার বুকে। মেলাম াইনেরগ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে আসে মহিম ঘোষ। আঁজলায় নিয়ে ছিটায় কুতুবুদ্দির মাথায়। গ্লাসটা ধরে তার মুখের ক াছে।

ধীরে ধীরে একটু সুস্থির হয় কুতুবুদ্দি। নিশ্বাস নিতে পারে স্বাভাবিকভাবে। কাশি কমে গেছে। কিন্তু তখনও তার চোখে পানি আর পিঁচুটি, শ্লেষ্মা মেখে গেছে বুকের কাছে উর্দিতে, তার দাড়ি ভিজে গেছে মুখের লালায়।

তার হাত ধরে লোকমান মিয়া - চলো বাবাজি। তোমার অবস্থা খারাপ। আমার সাথে চলো। তোমার ঘরে পৌঁছায় দি।

লন্ঠনের আলো ছেড়ে ওরা বেরিয়ে আসে অন্ধকার পথে। ঘাটের দিকে এগুচ্ছে। এমনিতেই রাতে চোখে কম দেখে কুতুবুদ্দি।তার ওপর শরীরের এই অবস্থায় পুরো দিশা হারিয়ে ফেলেছে। লোকমানের হাত আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলে সে। ঘাটে পৌঁছে লোকমান বলে -- তোমার তো নাও চালানোর অবস্থা নাই। তোমার নাও ঘাটেই বান্দা থাকুক। তুমি আমার নায়ে চলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে ওঠে কুতুবুদ্দি - কভি নেহি। হাম স্যালো নৌকাত নাহি চড়েঙ্গা।

---আরে বাপু আপদ - বালাইয়ে সবকিছু মানতে হয়! অন্য সময় না হয় নাই-ই চড়লে। এখন তো বাঁচো।

--- নাহি! হাম মেলেটারি লোক। শির দেগা কিন্তু পাগড়ি নাই।

--- ধুশ শালা মেলেটারির গুষ্টি মারি! লোকমান ক্ষেপে ওঠে। শালার বুড়া মাতালের কপালে আজ খারাপি আছে।

--- থাকুক। হাম স্যালো নৌকাত নাহি চড়েঙ্গা তো নাহি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। লোকমান চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসে --- বুড়া মাইনষের এত জেদ ভালো না বাপু। চলো! তুমি আমার সঙ্গে চলো।

--- না, তুই খালি আমার নাওকান খুঁজ্যা দে।

লোকমান আর রা কাড়ে না। কুতুবুদ্দির হাত ধরে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় তার নৌকায়। হাতড়ে লন্ঠনটা খুঁজে বের করে জ্বালিয়ে ছইয়ের সাথে ঝুলিয়ে দেয়। বৈঠা তুলে দেয় কুতুবুদ্দির হাতে। কিন্তু তার মনের খচখচানি যায় না। সে অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে --- ও বাপজি, নাও বাইতে পারবা তো?

--- হ্যাঁ হ্যাঁ পারব। তুই খালি রশিডা খুল্যা দে।

লোকমান ছোট্ট লাফ দিয়ে নেমে যায় পাড়ে। রশি খুলে পা বাড়িয়ে ঠেলা দেয় কুতুবুদ্দির নৌকায়। বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে কুতুবুদ্দির নৌকা স্রোতের চলিষ্ণুতার সঙ্গী হয় কুতুবুদ্দি বৈঠা পানিতে ফেলে না। সে গলুইতে বসে থাকে বৈঠা হাতে নিয়ে পুতুলের মতো। নৌকা স্রোতের গতিতে চলতে থাকে।

অন্ধকারের মধ্যে কুতুবুদ্দির মনে হয় সে অনন্তকাল ধরে নৌকায় ভাসছে। হাতে বৈঠা। কিন্তু একবারও সে বৈঠা পানিতে ছোঁয়নি। তার সেই ইচ্ছাশক্তিই নেই। তবু নৌকা একটু একটু করে চলে। আকাশে কোনো তারাও নেই যে সেটা দেখে দিক ঠিক করবে। সে নিজেকে এবং নৌকাকে পুরোপুরি স্রোতের হাতে ছেড়ে দেয়। আর স্রোত একসময় ঠিকই তাদেরকে এক ড াঙার সাথে ভিড়িয়ে দেয়।এটা যে কোন ভিটা, তার বোঝার উপায় নেই। নিছিদ্র অন্ধকার। তবু ডাঙার সাড়া পেয়ে কুতুবুদ্দি নৌকা থেকে নেমে আসে। লন্ঠনটাখুলে নিলে ভালো হত। কিন্তু লন্ঠনের কথা তার মনেই নেই। সে আবছা ভাবে বুঝতে পারে এটা বোধ হয় ঘাসিপিরের ভিটা।সারা বছরঅন্ধকার আর ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। শুধু চৈত্রসংক্রান্তিতে ওরসের সময় লোকে পা দেয় এই ভিটায়। কুতুবুদ্দি কয়েক পা এগোয়। কিন্তু মাজারের টিনের চালার নীচে পৌঁছানো অন্ধকারে ত ার কাছে অসম্ভব মনে হয়। পায়ের নীচে নরম ঘাস। সে ওই ঘাসের ওপর বসে। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। সাপ - খোপ থাকতে পারে। সেসব কথা তার মনেই পড়ে না। পিঠের নীচে মাটির স্পর্শ তার ভালো লাগছে। সে আক্লেশে ঘুমিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

।। তিন ।।

স্বপ্নের মধ্যে কুতুবুদ্দি ফ্রন্টে পৌঁছে যায়। সামনাসামনি যুদ্ধ চলছে। গুলি ছুটছে দিক - বিদিক। আকাশে আগুন জ্বেলে ছুটে আসছে কামানের গোলা। লেপ্টান টমসনের বন্দুক থেকে ছুটে মৃত্যুবান। একটা বন্দুকের গুলি ফুরালেই ফেলে দিয়ে অ ারেকটা বন্দুক তুলে নিচ্ছে সাহেব। সেই ফাঁকা ফাঁকা বন্দুকে গুলি ভরছে কুতুবুদ্দি। হঠাৎ সে দেখল সাহেব ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। তার দিকে ছুটে আসছে অসংখ্য গুলি। কিন্তু সাহেবের পরোয়া নেই। সে গুলির মধ্যেই ছুটে গেল সামনের টিলার পেছনে।শ্বাস বন্ধ করে সাহেবের কাণ্ড দেখছিল কুতুবুদ্দি। এইবার সাহেব ঢিবির আড়াল পাওয়াশ্বাস স্বাভাবিক হল। সে ট্রেঞ্চ থেকে গলা বাড়িয়ে বলল -- এইভাবে গুলি মধ্যে ছুটলেন ক্যান ছার?

টমসন সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বুকের কাছে উর্দিতে টোকা মেরে বলল--- এটা হল হার ম্যাজেস্টি মহারানির ইউনিফর্ম। এখানে বুলেট লাগলে স্লিপ করে চলে যায়। ভেতরে ঢুকতে পারে না।

এবার গুলিবর্ষণের শব্দ আরও বেড়ে গেল। আর সেই সব বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কুতুবুদ্দির।

চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে রইল কুতুবুদ্দি। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কিন্তু সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে বন্দুকের গর্জন। তার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে গুলি। ঘাটে ভটভট করে এসে ভিড়ছে স্যালোর নৌকা। চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে হতবুদ্ধি হলেও মিলিটারি নিয়ম ভোলেনি কুতুবুদ্দি। সে উপুড় হয়ে শুল। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল নিশ্চল।

ধীরে ধীরে কমে এল গুলির শব্দ। দুদ্দাড় ছুটে চলে গেল কয়েকজন মানুষ। স্যালোর নৌকা স্টার্ট দিয়ে খুব দ্রুত চলে গেল ঘাট ছেড়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হুইসেল বেজে উঠল। টর্চের আলো ছুটাছুটি করছে এদিক - ওদিক। কুতুবুদ্দি উঠে নিতম্বের ওপর বসেছে ততক্ষণে। একটা টর্চের আলো সরাসরি এসে পড়ল তার মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ----প াইছি স্যার। একজনারে পাইছি।

চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় হাত তুলে চোখ আড়াল করতে গেল কুতুবুদ্দি। সঙ্গে সঙ্গে হুংকার এল --- খবরদার, নড়াচড়া করলেই গুলি!

কুতুবুদ্দি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সেদিকে। ছুটে এল আরও কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ। আরও গোটা তিনেক শক্তিশ ালীটর্চ আলো ফেলল কুতুবুদ্দির ওপর। কয়েকজন ঘিরে ধরল তাকে। একটা কণ্ঠ ভেসে এল --- শালার চেহারা দ্যাখ! কী ভয়ংকর! এই শালা বল তোর সঙ্গীরা কোথায়?

কুতুবুদ্দি সেই আবছায়ার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলল -- ছার।

--- বল শালা! কোথায় পালিয়েছে তোর সঙ্গীরা? শালার দিনে - দুপুরে বেলতলি ফাঁড়ি লুঠ করেছিস আজ! এত স াহস! ভাবিস পুলিশ তোদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে। শালার সর্বহারা করাপাছার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

কুতুবুদ্ধি আবার বলল -- ছার, আমি মেলেটারি লোক...

---মিলিটারি? শালা ভ্যাক ধরছ!

একজন চুলের মুঠি ধরে কুতুবুদ্দিকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর দড়াম করে ঘুষি মারল বুটের লাথি। আবার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করানো হল তাকে।

--- বল শালা! তোর সঙ্গীরা কোথায়? সর্বহারার বাচচারা?

--- ছার, আমি ছার মেলেটারি। এই দ্যাখেন ছার আমার উর্দি।

--- ইউনিফর্ম দেখানো হচ্ছে! --- একজন মুঠো করে তার উর্দির কলার চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন ধরে গেল কুতুবুদ্দির। তার উর্দিকে অপমান! সে বুড়ো হাতের ঝটকায় নিজের কপাল ছাড়িয়ে নিতে চাইল --- খবরদার! মহারানির উর্দি। গুলি করলেও ঢুকে না পিছলায় যায়।

ক্রোধের মধ্যেও হেসে উঠল কয়েকজন।

আর সহ্য করতে পারল না কুতুবুদ্দি। ঠাস করে চড় কষাল তার কলার ধরে থাকা লোকটার গালে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশটা কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে চেপে ধরল কুতুবুদ্দির বুকে।

মরার সময় অন্তত ভুলটা ভাঙল কুতুবুদ্দির। মহারানির উর্দি, বুলেট তো বুলেট, একটা মশার হুলকে পর্যন্ত ঠেকাতে প

ারে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com